সূচনা:Mary Douglas এর Implicit meanings Essays in anthropology (অন্তর্নিহিত অর্থ: নৃবিজ্ঞানে প্রবন্ধ) বই এর ৪র্থ অধ্যায় Couvade and Menstruation The Relevance of Tribal Studies (কুভাড ও ঋতুস্রাব: আদিবাসী অধ্যয়নের প্রাসঙ্গিকতা) উপস্থাপন করবো। ৪র্থ অধ্যায়টি Couvade ও ঋতুস্রাব (Menstruation) সম্পর্কিত আদিবাসী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করে। এটি দেখায় যে, সমাজ ও সংস্কৃতির কাঠামো কীভাবে জৈবিক বিষয়গুলোর অর্থ নির্ধারণ করে।
Mary Douglas ছিলেন একজন বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী, যিনি প্রতীকবাদ (Symbolism) এবং সংস্কৃতির সামাজিক ব্যাখ্যা নিয়ে কাজ করেছেন।

আমাদের সবার একই ধরনের মানবদেহ রয়েছে, যেখানে সমান সংখ্যক অঙ্গছিদ্র রয়েছে। একই শক্তি ব্যবহার করি এবং একইভাবে জৈবিক সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করি। মেরি ডগলাস আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ধ্যান ধারণা নিয়ে কাজ করেছেন। তবে এসব ক্ষেত্রে আদিবসীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো ও চিন্তাভবানা ভিন্ন হয়ে থাকে। তারা এমন কোনো শারীরিক অবস্থা কল্পনা করতে পারে না, যার ধর্মীয় আচরণ বা আচার-অনুষ্ঠান বিশ্বব্যাপী একরকম হয়ে থাকে।
মৃতদেহের প্রতি ভয় কিংবা মৃতদেহ স্পর্শের ফলে অশুচিতাকে মালিনোস্কি একটি সার্বজনীন মানব অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখেছিলেন। তবে এটি সর্বত্র ধর্মীয় আচারের অংশ হয়ে ওঠেনি। যেমন: নিউ গিনি হাইল্যান্ডসের মাই এঙ্গা(Mae Enga) জনগোষ্ঠী মৃতদেহের সংস্পর্শে এলেও বিশেষ কোনো শুদ্ধিকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করে না, তবে তারা যৌন মিলনের পরে নিজেদের শুদ্ধ করে (Meggitt, 1964)। অন্যদিকে, তানজানিয়ার নায়কুসা(Nyakyusa) জনগোষ্ঠী শোকাহত এবং দাফনকারী দলকে স্বাভাবিক সমাজে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কিছু আচার পালন করে। যেমন: জটিল ধোয়া/গোসল করা, আলাদা থাকা এবং ধূপকর্মের মতো শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে (Wilson, 1957)। মেরি ডগলাস বলেন এই একই রকম শুদ্ধিকরণ ঋতুস্রাবের ভিন্ন ভিন্ন আদিবাসী ভিন্ন ভাবে দেখে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া এ বিষয়ে প্রযোজ্য। ভিন্ন আদিবাসী সমাজে ভিন্ন আচার আচরণ প্রচলিত থাকে। মেরি ডগলাস বলেন আদিবাসীরা কোন বিষয়কে শুদ্ধ আর কোনটাকে অশুদ্ধ বলে এবং এই শুদ্ধ অশুদ্ধ নির্বাচনের পিছনে কী কাজ করে। সেটা আমাদের জানা জরুরী। আদিবাসী সমাজে এটি সর্বত্র ধর্মীয় বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রতিটি প্রাচীন সংস্কৃতি শরীরের নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রমকে(ঋতুস্রাবকে) বিপজ্জনক বা পবিত্র হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সে অনুযায়ী আচরণ নির্ধারণ করে। সুতরাং, আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার মূলনীতি কীভাবে কাজ করে তা বোঝা।

মেরি ডগলাস বলেন পুরো বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান কখনোই একরকম থাকে না। এসব আচার আচরণ গুলো। এমন নয় যে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময় ধরে চলে আসছে, এগুলো। অপরিবর্তিত কোনো। বিষয় নয় অর্থাৎ মানুষের আচার-অনুষ্ঠান গুলো সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। মানুষ তাদের বিশ্বাসের মধ্যে বেঁচে থাকে। কখনও সেগুলো এড়িয়ে যায়, আবার কখনও একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে। ।ডগলাস বলেন আমদের সেই ভাবনা টা ভূল যেখানে আমরা মানুষকে এমন কিছু নিয়ন্ত্রণে ভাবি যা আমাদের কাজকে এবং জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ডগলাস এটাকে এক ধরনের ভ্রম মনে করেন। ডগলাম মনে করেন সৃষ্টতত্বের মধ্যেই মানুষ বসবাস করেন। ডগলাস এখানে বলেন এই যে আমরা মনে করি আমাদের উপর বহিরাগত কোনো। শক্তির প্রভাব রয়েছে এর মাধ্যমে মানুষ Cosmology এর প্রয়োগকে এড়িয়ে চলতে চায়। একটি ভাষা জীবদ্দশায় যেমন পরিবর্তিত হয়, ঠিক তেমনি আচার-অনুষ্ঠানও সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়।
এখানে দুটি বিষয়কে একসাথে বুঝতে হবে। যথাঃ
১। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান কিছু শারীরিক বিষয়কে গুরুত্ব দেয় এবং কিছু বিষয়কে উপেক্ষা করে। যেমন : নারীর ঋতুস্রাবের বিষয় নিয়ে যেমন কথা বলা হয় তেমনি পুরুষের কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলা হয় না।
২। এসব আচার অনুষ্ঠান মানুষ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। যারা একসাথে থাকতে চায় তারা এসকল আচার অনুষ্ঠানকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে ও পরিবর্তন করে।

আমাদের উচিত সেই বিষয়গুলো খুঁজে বের করা যা সব জায়গাতেই একরকম নয়। কারণ সেখান থেকেই আমরা জানবো বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কেন কিছু বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আচার অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অর্থ থাকে।যেমন: মানসিক,সামাজিক,সাংস্কৃতিক। এক্ষেত্রে আমরা একটি সাধারণ শারীরিক অবস্থার কথা ভাবতে পারি এবং সেই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে যে সব আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। যেমন: ঋতুস্রাব। ঋতুস্রাবের আচার-অনুষ্ঠানগুলো রক্ত, নারীত্ব, সন্তানধারণ ক্ষমতা, বা সন্তান না হওয়ার মতো কিছু সাংস্কৃতিক অর্থ ব্যবহার করে। এরপরের স্তরে থাকে সামাজিক অর্থ। এখানে দেখা হয় বিভিন্ন সমাজে আচারের অর্থগুলো কিভাবে নির্বাচিত হয়।
(i) পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
এটি পরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতার ধারণার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। নারীর অপবিত্রতা প্রকাশ করা মানে নারীর নিম্নস্থানকে প্রকাশ করা। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, কোনো নির্দিষ্ট গৃহে একজন স্ত্রীকে এই বার্তা স্পষ্টভাবে বোঝানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

(ii) পুরুষ ও নারীর পৃথক সামাজিক ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা।
পুরুষেরা নারীদের তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বাধা দিতে চাইতে পারে, অথবা এই বিশ্বাসগুলো কেবলমাত্র বিদ্যমান সামাজিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করতে পারে, যেখানে পুরুষ ও নারীদের আলাদা আলাদা দায়িত্ব ও আগ্রহের ক্ষেত্র রয়েছে। ঋতুমতী নারীদের আলাদা রাখতে বাধ্য করা এই বিষয়টিকে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যখন কোনো পুরুষ শিকার বা কৃষিকাজে ব্যর্থ হয়, তখন তিনি সরাসরি খারাপ আবহাওয়াকে দায়ী না করে বলেন যে, আবহাওয়া হয়তো খারাপ হয়েছিল, কিন্তু তা হতো না যদি ঋতুমতী নারীরা নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকতেন। আমি কাসাই অঞ্চলের লেলে জনগণের মধ্যে এই ধরনের যুক্তি প্রচণ্ডভাবে তোলা হতে দেখেছি।

(iii) প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো।
নারীরা নিজেরাও এই ধরনের বিশ্বাসকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। লেলে জনগণের বিশ্বাস, ঋতুমতী নারীর রান্না করা খাবার বিপজ্জনক। ফলে, নারীরা একে অপরকে দোষারোপ করতে এবং পারিবারিক বিপর্যয়ের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্ত্রীর উপর দোষ চাপাতে এই বিশ্বাসকে কাজে লাগাতে পারে।

এসবই সহজবোধ্য ও স্পষ্ট। ঋতুস্রাব সংক্রান্ত রীতিনীতি কেবল বিপদসংক্রান্ত বিশ্বাসের একটি দৃষ্টান্ত, যা সমাজে ভূমিকা, দায়িত্ব এবং মর্যাদাকে চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। এগুলো শুধু সামাজিক পার্থক্য ও কর্তব্য সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ প্রকাশ করে না, বরং সবাইকে এই কাঠামোর মধ্যে বাধ্য করার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

উদাহরণস্বরূপ, পরকীয়ার পরে বিপদের বিশ্বাসগুলো স্পষ্টভাবে একটি প্রতীকী ভূমিকা পালন করে এবং এটি সমাজকে বাধ্য করার ক্ষমতা রাখে। একইভাবে, খুনের মাধ্যমে দূষিত হওয়া, অপরিচিত ব্যক্তিদের দূষিত মনে করা, সাধারণ মানুষের মাধ্যমে রাজপরিবারের দূষিত হওয়া—এসব বিশ্বাস একই ধরণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর অংশ। ঋতুস্রাবজনিত অপবিত্রতা একটি বৃহত্তর দূষণ বিশ্বাসের ধারাবাহিক অংশ।
সম্প্রতি প্রকাশিত একটি লেখায় (Douglas, 1966) বলেন,আমি এমন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছি বলে মনে হতে পারে যে, বিপদসংক্রান্ত বিশ্বাসগুলি নৈতিকতা রক্ষা করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। আমি এমন ধারণা দিয়েছিলাম যে, এই বিশ্বাসগুলো বিচ্যুতি দমন করতে এবং সাধারণ একটি নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য করতে সক্ষম, যা আচরণের উপর একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেয়। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিতভাবেই ভুল।

এই বিশ্বাসগুলো আসলে সাধারণ সামাজিক স্বীকৃতির ফল। এগুলো প্রকাশ্যে এবং দৃশ্যমানভাবে সামাজিক নিয়মকে প্রকাশ করে, তবে এগুলোর ক্ষমতা শুধুমাত্র মানুষের সেই নিয়মের প্রতি সম্মানের উপর নির্ভর করে। এটি স্বাভাবিকভাবেই বিপদসংক্রান্ত বিশ্বাসকে ব্যবহার করে সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে। যারা ঐ নিয়মের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ নয়, তারা এই বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেবে না।

বিপদসংক্রান্ত বিশ্বাস ব্যবহারের আরেকটি পদ্ধতি:

(iv) একটি বিশেষ সম্পর্ক দাবি করা

তানজানিয়ার ছোট ও দরিদ্র শিকারি গোষ্ঠী হাদজা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক গঠন অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। একদল লোক একটি গোষ্ঠী ছেড়ে চলে যায়, নতুন সদস্য যুক্ত হয়, দল ভেঙে যায় এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ভিন্ন সদস্যদের নিয়ে পুনর্গঠিত হয়। গোষ্ঠীর স্তরে মানুষ আসা-যাওয়া করে এবং কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক ইউনিটের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না।

কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্তরে কিছু শক্তিশালী সামাজিক চাপ বিদ্যমান। পুরুষেরা নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক রাখতে চায়—এটি তাদের প্রধান চিন্তা। তবে নারীরা পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল নয় কারণ শ্রম বিভাজন খুবই দুর্বল এবং তারা নিজের এবং তাদের সন্তানদের যত্ন নিতে পারে, কেবল মাংস এবং বাণিজ্যপণ্যের জোগানের ক্ষেত্রে তাদের কিছু নির্ভরতা থাকে।

এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ যৌন ও অর্থনৈতিক নির্ভরতার কারণে, বিবাহের বন্ধন ভঙ্গুর এবং সহজেই ভেঙে যেতে পারে। এখানে ঋতুস্রাবজনিত বিপদের বিশ্বাস বিবাহিত দম্পতিকে সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহৃত হয়।

ড. জেমস উডবার্ন (যার অপ্রকাশিত পিএইচডি গবেষণাপত্র থেকে এই তথ্য নেওয়া হয়েছে, Woodburn, 1964) বর্ণনা করেছেন যে, একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠী বিপদের সম্মুখীন হতে পারে যদি একজন পুরুষ তার ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যায়।

ঋতুস্রাব চলাকালীন স্বামীর জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে:

1. তিনি বিষাক্ত তীর ছুঁতে পারবেন না।

2. তিনি মৌমাছির বাসায় হাত দিতে পারবেন না।

যদি তিনি এই নিয়ম না মানেন, তাহলে—

তীরের বিষ কার্যকারিতা হারাবে।

পুরো অঞ্চলের মৌচাকের মধু মৌমাছিরা খেয়ে ফেলবে।

এখানে অন্যান্য লোকেরা নিশ্চিত হতে চায় যে স্বামী এই নিষেধাজ্ঞাগুলো মেনে চলেন, কারণ—

পুরুষেরা চায় না যে, জুয়া খেলার সময় তীরের বিষ নষ্ট হোক।

পুরুষ ও নারী উভয়েই সকল মধু হারানোর সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

এইভাবে, ঋতুস্রাবজনিত বিপদ বিশ্বাস বিবাহের স্বীকৃতি জোরদার করতে ব্যবহৃত হয় এবং স্বামীকে তার দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখতে বাধ্য করে।

এর ফলে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এই সময়ে নিজ নিজ লিঙ্গ গোষ্ঠী থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। যখন স্ত্রী ঋতুমতী হন, তখন স্বামী কিছু পুরুষোচিত কাজ থেকে বিরত থাকেন।

ড. উডবার্ন এই রীতির একটি মনোমুগ্ধকর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেখানে দেখা যায় যে, এটি স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই বৃহত্তর সম্প্রদায় থেকে সাময়িকভাবে আলাদা করে, যা মাসিক ভিত্তিতে তাদের সম্পর্ককে পুনরায় নিশ্চিত করে।

কিন্তু আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, স্বামী এখানে বিপদসংক্রান্ত বিশ্বাসকে ব্যবহার করে তার বৈবাহিক সম্পর্ককে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। স্ত্রীকে দাবি করার তার অধিকার সবসময় চ্যালেঞ্জের মুখে থাকে, এবং তিনি কখনও নিশ্চিত হতে পারেন না যে, স্ত্রী তাকে পরবর্তী মাসেও গ্রহণ করবেন কিনা। এই অনিশ্চিত স্বামী বিপদ বিশ্বাসকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন।

তিনি যখন তার সহকর্মীদের সাথে যোগ দেন না, প্রতিদিনের স্বাভাবিক কাজকর্ম করেন না, এবং তার স্ত্রীও কিছু নারীসুলভ কাজ থেকে বিরত থাকেন, তখন তিনি সমাজের মঙ্গল কামনায় সচেতনভাবে একটি ভূমিকা পালন করছেন।

তবে তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের শারীরিক দিকটিকে সামনে আনা।

তিনি প্রাকৃতিক শক্তিকে আহ্বান করছেন যেন তা তার স্ত্রীকে নিজের বলে প্রমাণ করতে পারে।

এই সমাজে বিবাহের সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত না থাকায়, কল্পনা করা যায় যে, একজন নারীর ঋতুস্রাব চলাকালীন তার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী স্বামীও কাজ থেকে বিরত থেকে প্রতিযোগিতা করছেন—তাদের অসাবধানতার কারণে শিকার ও মধু সংগ্রহে ব্যর্থতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে নিজেদের বৈধ স্বামী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন।

এটি অনেকটা লুগবারা জনগোষ্ঠীর প্রবীণদের মতো, যারা উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে দাবি করেন যে তাদের অনুসারীদের অসুস্থতার জন্য তারাই দায়ী (Middleton, 1960)।

কিছু সমাজে বিশ্বাস করা হয় যে পুরুষদের তীরের বিষ নষ্ট যেতে পারে যদি তারা নিষেধাজ্ঞা না মেনে চলে।
স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতা: স্ত্রীর ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে স্বামী নির্দিষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকে।যেমনঃ শিকার বা অন্যান্য পুরুষালি কাজ। এটা স্বামী স্ত্রীর এক ধরনের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার প্রতিফলন।

* সামাজিক পরিচয়: স্বামী নিজের সম্পর্কের দাবিকে প্রকাশ করতে কিছু কাজ, যেমনঃ বন্ধুদের সাথে মেলামেশা না করা এড়িয়ে চলা, যেন সমাজ তাকে স্ত্রীর প্রকৃত স্বামী হিসেবে গ্রহন করে।

* ঋতুস্রাব ও দাম্পত্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা: কোনো সমাজে পুরুষরা নিজেদের দোষ স্বীকার করে সমাজের কাছে ক্ষমা চাইতে পারে। যদি তাদের স্ত্রী ঋতুস্রাব চলাকালীন শিকার বা মধু সংগ্রহে ব্যর্থ হয়।

* কুভাদ প্রথা: কিছু সমাজে, একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সন্তান প্রসবের সময় নিজেও শারীরিক কষ্টের অভিনয় করে যা তার পিতৃত্বের প্রমান হিসেবে দেখা হয়।
কিছু সমাজে বিবাহ এবং সম্পর্কের বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য পুরুষদের আচরণগত রীতি-নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এখানে কুভাদ নামক একটি ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কুভাদ এমন একটি প্রথা যেখানে একজন স্বামী সন্তান জন্মদানের সময় স্ত্রীর মতো আচরণ করে।যেমনঃ কষ্ট অনুভব করা বা প্রসব যন্ত্রণার অভিনয় করা। লেখক বলেছেন যে, এটি পিতৃত্বের একটি আদিম প্রমাণ হিসেবে দেখা হতে পারে। যা সমাজে পুরুষের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে।
লেখক এটাও বলেন, কিছু নৃতাত্ত্বিক যেমনঃ টেইলর, বাচোফোন,ক্রাউলি, কুভাদ প্রথা কে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসেবে দেখেছেন। তবে লেখক এটাকে এমন একটি বিশ্বাস হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন যা সমাজে ব্যক্তিরা নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করে।
তাছাড়াও লেখক বড় বড় সামাজিক রীতিনীতি এবং আচার অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করেন। যেমনঃ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, শেষকৃত্য, বিবাহ এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত রীতিনীতি। এই ভিডিওগুলো সমাজে মৌলিক মূল্যবোধ তুলে ধরে।

তিনি উদাহরণ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের একটি কঠোর আচার উল্লেখ করেন। যেখানে ছেলেদের যৌনাঙ্গ কেটে রক্তপাত ঘটানো হয়। যা নারীদের ঋতুস্রাবের অনুকরণ। লেখক ব্যাখ্যা করেন যে, এটি নারীদের প্রজনন ক্ষমতার প্রতি পুরুষদের ঈর্ষার প্রতিফলন।
বিপরীত লিঙ্গের যৌনাঙ্গের প্রতি ঈর্ষা অনেক আচার অনুষ্ঠানের জন্মদিন। পুরুষদের মধ্যে এটি দেখা যায় লিঙ্গচ্ছেদ বা খৎনার মাধ্যমে তারা নারীদের ক্ষেত্রে এটি ক্লিটোরিস বা ল্যাবিয়ার বৃদ্ধি করার চেষ্টার প্রতিফলিত হয়।
কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীতে ছেলেদের যৌনাঙ্গ থেকে রক্তপাত ধরানোর রীতি রয়েছে। যা প্রতিকীভাবে মাসিকের অনুকরণ করে। যারা এসব জানত না লেখক তা ব্যাখ্যা করেছেন পুরুষের গর্ভ ঈষা থেকে।

এই লেখাটির মূল বক্তব্য হলো সমাজে প্রতীকী আচরণ ও শরীরের প্রতীকী ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক ও গঠন বোঝানো।

উদাহরণস্বরূপ,
সুদানের ডিঙ্কা সমাজ পশুপালন ভিত্তিক সমাজ,যখন তারা গরু বলি দেয়, তখন তারা নির্দিষ্টভাবে গরুটিকে কাটার পদ্ধতি অনুসারে সামাজিক সমস্যার সমাধান বোঝায়। যদি রক্ত-শত্রুতার মীমাংসার জন্য বলি দেওয়া হয়, তাহলে গরুটিকে মাঝখান দিয়ে কেটে দুই পক্ষের মধ্যে ভাগ করা হয়, এবং ঐ পুরো গোষ্ঠির মধ্যে দিয়ে দেয়া হয়। যা শত্রুতার অবসান বোঝায়। যদি কোনো মৃত্যুর কারণে দেয়া হয় তাহলে পশুটিকে পায়ে ধরে দম বন্ধ করে মারা হয়। আবার, নৈতিক অপরাধ যেমন অন্তঃসত্বা সম্পর্ক (incest) রোধের জন্য বলি দেওয়া হলে, গরুটিকে লম্বালম্বিভাবে কেটে দুই ভাগ করা হয় যৌনাঙ্গ বরাবর। যা ভবিষ্যতে সম্পর্কের সীমারেখা নির্ধারণ করে। এবং তাদের ধারণা এমন থাকে যে আমরা দুই গোষ্ঠী দুটি ভিন্ন বাচ্চা দানের ঐতিহ্যে প্রবেশ করছি। ডগলাস বলেন যেভাবে করে ষাড় কে বলি দেওয়া হয় সেটা আসলে আমরা যে শরীরের রাজনীতির কথা বলি তার একটি ইমেজ।

ডগলাস বলেন বেটেলহাইম-এর Symbolic Wounds পড়ছিলাম, প্রশ্ন করেন—এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো কেন এত ব্যাকুল হয়ে এমন স্থানে সমতা (symmetry) তৈরি করতে চায়, যেখানে তা স্পষ্টতই অনুপস্থিত? কেন তারা তাদের দীক্ষা-অনুষ্ঠানে ছেলেদের এমনভাবে রূপান্তরিত করতে চায় যেন তারা নারীদের মতো প্রজননক্ষম শক্তি অর্জন করে? নারী-পুরুষের মধ্যে কৃত্রিম সমতা সৃষ্টি করার এই চর্চাটি গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ দ্বৈত বিভাজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সত্যিই, মর্নগিন (Murngin) জনগোষ্ঠী দুটি মোয়েটিতে বিভক্ত—এরা পরস্পরবিবাহে লিপ্ত, নারী আদান-প্রদানকারী দুটি অর্ধাংশ। আর আরুনতা (Arunta) জনগোষ্ঠীতে রয়েছে সেকশন সিস্টেম—মূলত মোয়েটিকে আবার ভাগ করা হয়েছে। তাই এই ব্যাখ্যাটা যৌক্তিক মনে হয়েছিল: দীক্ষার মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা তৈরি করা হচ্ছে সমাজের দ্বৈততার প্রতিফলন হিসেবে। যদি সমাজের প্রত্যেক সদস্য দুই ভাগের মধ্যে বিনিময় বজায় রাখতে আগ্রহী থাকে, আর যদি এই বিনিময়ের জন্য সমতা অপরিহার্য হয়, তাহলে ছেলেদের যৌনাঙ্গে ছেদন হয়তো একটি সমবেত সামাজিক উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ। ডগলাস বেটেলহাইম যেসব জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাদের দীক্ষা-অনুষ্ঠান ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করেন।

তবে বিষয়টিকে ভালোভাবে তুলে আনার জন্য ডগলাস দুটি উদাহরণ দেন—যেখানে পুরুষ-যৌনাঙ্গ রক্তপাতকে নারীর ঋতুস্রাবের সমান্তরালে দেখা হয়েছে; এবং যেখানে এই সমতা গোষ্ঠীর দ্বৈত বিভাজনের সঙ্গে যুক্ত। ডগলাস মার্গারেট মিড-এর ১৯৩৮ ও ১৯৪০ সালের লেখা থেকে নিউ গিনির মাউন্টেন অ্যারাপেশ এবং ইয়ান হগবিন-এর ১৯৩৪-৫ সালের প্রতিবেদন থেকে নিকটবর্তী ওগেও জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেন।

অ্যারাপেশদের বিশ্বদর্শনে সমস্ত শক্তি ও প্রেরণার উৎস হিসেবে যৌনতাকে দেখা হয়; এখানে নারী ও পুরুষের যৌন শক্তিকে সমান এবং সমভাবে বিপজ্জনক বলে বিবেচনা করা হয়। উভয় লিঙ্গই তাদের নিজস্ব যৌন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে উর্বরতা ও বিকাশের স্বার্থে। অতিরিক্ত যৌন শক্তি, যদি তা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে তা সবার জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। শুধু নারী নয়—নারীর ঋতুস্রাব যেমন পুরুষ ও শিশুদের জন্য হুমকির, তেমনি পুরুষও বিপজ্জনক—তাঁরও নিজস্ব যৌনশক্তি আছে। এই যৌনশক্তি রক্তে প্রকাশিত হয়: নারী ভালো রক্ত দিয়ে গর্ভে সন্তান লালন করে, কিন্তু তাঁর ঋতুস্রাবের রক্ত ক্ষতিকর; পুরুষের রক্ত তাঁর পুরুষাঙ্গে থাকে, যা জীবনীশক্তিসম্পন্ন এবং তিনি তা সন্তানকে খাওয়ানোর জন্য বের করে আনেন—গর্ভে ভ্রূণ পুষ্টির ঠিক সমান্তরালে। নারীর ঋতুস্রাব তাঁকে শক্তি দেয়, কারণ তা তাঁর শরীর থেকে পুরুষের যৌন তরল বের করে দেয়। পুরুষেরা এই শুদ্ধির প্রক্রিয়া কৃত্রিমভাবে অর্জন

করে পুরুষাঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে। ছেলেদের দীক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু এই রক্তক্ষরণ। এখানে আমরা দ্বৈততা এবং সমতা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, আচার ও বিশ্বদর্শনে।

তবে সামাজিক কাঠামো কেমন? আমরা দেখি যে এখানে সমাজ কাঠামো খুবই দুর্বল।

একটি আদর্শ গ্রামীণ দৃশ্যপটে দেখা যায়—ছোট ছোট পল্লীসমূহ, যা পারিবারিক সম্পর্ক ও আনুষ্ঠানিক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হলেও প্রকৃত সংহতি নেই। অপরাধ দমনের কোনো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা নেই, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব নেই, এমনকি যে কোনো একটি পল্লী বাইরের কারো সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। সমগ্র অঞ্চলের সামাজিক প্রক্রিয়া নির্ভর করে আত্মীয়তার বন্ধনের ওপর, এবং পলিনেশিয়া বা আফ্রিকার মতো আত্মীয়তা-ভিত্তিক রাজনৈতিক পরিকাঠামো এখানে নেই।

অ্যারাপেশদের দুটি কাঠামো আছে যা আত্মীয়তার এই দুর্বল ভিত্তিকে বৃহত্তর রূপ দেয়: একটি দীক্ষা এবং একটি ভোজকে ঘিরে। মিড বলেন, 'অ্যারাপেশদের দ্বৈত সংগঠনের দুটি ধরন আছে, যা প্রায় কার্যকর নয়, কেবল বক্তৃতায় ব্যবহারের জন্য মূল্যবান; একটি ভোজের সঙ্গে, অন্যটি দীক্ষা আচারর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তবে দুটোই অস্পষ্ট।' ১৯৩৮ সালে এটি বলা হলেও আজকের একজন নৃতাত্ত্বিককে প্রমাণ করতে হবে যে এই 'অস্পষ্টতা' বা 'কাজের অভাব' মূলত পর্যবেক্ষকের নিজস্ব ব্যাখ্যা। তবে অ্যারাপেশরা নিজেদের দ্বৈত সংগঠন নিয়ে গভীর আবেগ পোষণ করত। মিড বলেন, যখন একটি ভৌগোলিক বিভেদ দেখা দেয় এবং একটি অঞ্চল কেবলমাত্র দ্বৈত বিভাজনের একটিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তারা নিজেদের আবার দুইভাগে ভাগ করে নেয়, এবং প্রতিটি ভাগ একটি করে বাজপাখির প্রতীক গ্রহণ করে।

হগবিন আমাদের বলেন, ওগেওদের বিশ্বদর্শনও যৌনশক্তি দ্বারা চালিত।

ওগেও সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও যৌন শক্তি:

হগবিন (Hogbin) বর্ণনা করেছেন যে, ওগেও জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস যৌন শক্তির দ্বারা প্রভাবিত। তাদের মতে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক বিপজ্জনক কারণ এতে শরীরের রস একে অপরের মধ্যে প্রবাহিত হয়। নারীরা স্বাভাবিকভাবে ঋতুস্রাবের মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করে নেয়, কিন্তু পুরুষদের রোগ প্রতিরোধ করতে হলে, নিয়মিত পুরুষাঙ্গ ছেদন করে রক্ত ঝরাতে হয়। একে 'পুরুষের ঋতুস্রাব' বলা হয়... পুরুষেরা আরও রক্তক্ষরণ করে যখন তারা এমন কিছু কাজ করে যা জাদুবিদ্যার কারণে বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়।

এই রক্তপাতের প্রথা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত, যেমন:

১.নতুন পুরুষদের ঘর তৈরি করা,

২.মৃতদেহ কবর দেওয়া,

৩.হত্যার অভিযানে যাওয়া,

৪.বালকদের দীক্ষাদান,

৬.বিপজ্জনক কাজের আগে নিজেদের শুদ্ধ করা।

ওগেও সমাজ ছোট ছোট পিতৃবংশীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত, কিন্তু এর পাশাপাশি দুটি বিপরীত মাতৃবংশীয় দলও রয়েছে, যা সমাজের বিভাজন নির্দেশ করে।

সামাজিক সংগঠনের দিক থেকে, তারা ছোট ছোট পিতৃকেন্দ্রিক বংশে বিভক্ত। এই বংশগুলোর ওপর দিয়ে কাটাকাটি করে চলে যায় দুটি এক্সোগ্যামাস মাতৃকেন্দ্রিক বিভাজন।

ডগলাস বলেন,এইসব বিষয় আমার তত্ত্ব যাচাই করার জন্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ উপাদান দেয়। তিনি আরও বলেন,আমি বলছি না যে প্রত্যেক পুরুষাঙ্গ ছেদই সমাজের দ্বৈত বিভাজনের প্রতীক। কিন্তু যদি স্পষ্টভাবে বলা হয় যে এই রক্তক্ষরণ নারীর প্রজননতন্ত্রের সমতার জন্য করা হয়, তাহলে আমি সেসব সমাজে আন্তনির্ভরশীল দ্বৈত সামাজিক বিভাজনের খোঁজ করব, যার সমতা এই রীতিতে প্রতিফলিত হয়।

উপসংহার: যদি মনোবিজ্ঞানীরা আদিবাসী সমাজ অধ্যয়ন করে তাদের রোগীদের আচরণ বোঝার চেষ্টা করেন, তাহলে তারা যৌনতা ও প্রজননের অভিজ্ঞতার কোনো "বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক" অর্থ খুঁজে পাবে না। কারণ আদিবাসী সংস্কৃতিতে এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলিও বিশ্বদর্শন ও আচারিক শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে ব্যক্তির কাছে আসে। এমনকি নারী-পুরুষের শারীরিক পার্থক্যকেও এমনভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়, যার প্রধান উদ্দেশ্য একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোর প্রতিফলন ও টিকে থাকা নিশ্চিত করা। তাই আমি বলব, মনোরোগী রোগীদের আচরণ দিয়ে আদিবাসী আচার ব্যাখ্যা করা সঠিক নয়। বরং উল্টোটা করা যেতে পারে। যখন আমি বলেছিলাম যে কোভাড রীতি হয়তো স্বামীর স্ত্রীর উপর অনিরাপত্তা থেকে উদ্ভূত, তখন আমি একটি সামাজিক প্রেক্ষাপট দিয়েছিলাম—যেখানে এটি হয়তো প্রাতিষ্ঠানিক আকারে বা আত্মিক প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ পেতে পারে। তাহলে বেটেলহাইমের ক্লিনিকের সেই স্কিজোফ্রেনিক ছেলেটি, যে কিশোরী মেয়ের মতো ঋতুস্রাব করতে চেয়েছিল, সে হয়তো তার সামাজিক জগতে লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যজনিত বিভাজনের হুমকি অনুভব করছিল? তাহলে সে নারীত্ব আকাঙ্ক্ষা করছে না, বরং অ্যারাপেশদের মতো, যারা একটি ভাগে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ায় নিজেদের আবার ভাগ করেছিল, সেই ছেলেটি হয়তো চাচ্ছিল তার সমাজের ভাঙন ঠেকাতে—নারী-পুরুষ সমতা তৈরি করে।

সারকথা: আদিবাসী আচার বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের তার সামাজিক মাত্রা দেখতে হবে; এবং যে মনস্তাত্ত্বিক বা শারীরিক উপসর্গগুলো আদিবাসী আচার অনুরূপ, সেগুলো বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিতে হবে—সামাজিক প্রভাব ও সামাজিক রূপের প্রকাশ—উভয় স্তরেই।